পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

নবনীতা চৌধুরী শিক্ষিকা,
পালাশন গার্লস হাইস্কুল, বর্ধমান

শরীর ও মন সুস্থ থাকলে জীবনে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম

প্রাইমারির গণ্ডি পেরিয়ে তোমরা যখন হাইস্কুলে প্রবেশ করো, তখন থেকেই শুরু হয় জীবন সম্পর্কে একটা লক্ষ্য তৈরির মাত্রাবোধ। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয় প্রতিটি জায়গার সহযোগিতা নিয়ে একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে এগিয়ে যেতে হয়। সেই সহযোগিতাকে পাশে নিয়ে যত সচেতনভাবে নির্দিষ্ট গণ্ডি ধরে এগোবে জীবনে তত সফল হবে।

হাইস্কুলে পাঁচটি ক্লাস অতিক্রম করার পর বোর্ডের একটি বড় পরীক্ষা। যেটা জীবনে বড় হার্ডল। সেই হার্ডল অতিক্রম করার প্রস্তুতি কিন্তু একেবারে পঞ্চম শ্রেণি থেকেই।

বাংলার প্রতিটি গল্প বা কবিতা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিজে নিজে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা শিখতে হবে ছোটবেলা থেকেই। প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়গুলোকে খুঁটিয়ে এমনভাবে পড়তে হবে যাতে তার বেসিকটা সম্পর্কে ধারণা খুব স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়। নিজের দেশ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। ইংরেজির ক্ষেত্রেও একই ভাবে capital letter ও small letter-এর ব্যবহার সঠিকভাবে জানতে হবে। সঠিকভাবে বানান শিখতে হবে। যে বিষয়ই পড়ো না কেন, তার গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

শরীর ও মন সুস্থ রাখো। তাতে জীবনে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম। জানবে যার শরীর ও মন যত সুস্থ সে জীবনে তত সুন্দর। তাই সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠো ভিতরে ও বাইরে।

পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজন জেনারেল নলেজের দখল

তন্ময় মণ্ডল

এখন বিশ্বায়নের যুগ। তাই সময়ের সাথে পাল্লা দিতে প্রতিযোগিতা সর্বত্র। শিশু মানেই সমাজের বুনিয়াদ। জন্মের পর থেকে তাদেরও নেমে যেতে হচ্ছে প্রতিযোগিতায়। নিজের সন্তান যাতে এই প্রতিযোগিতা পিছিয়ে না পড়ে সেইজন্য কোনও কিছুতেই কমতি রাখেন না এখনকার অভিভাবকরা। এই সময়ে বাচ্চাদের ওপর তাই অনেক ছোটো থেকেই প্রচুর চাপ থাকে। পড়াশুনোর পাশাপাশি আঁকা, নাচ, গান এগুলো তো আছেই। তবে সাফল্য পেতে গেলে বাচ্চার সব বিষয়ে জ্ঞান থাকাটা জরুরি। জেনারেল নলেজ বাড়ানোটা এক্ষেত্রে খুব দরকার। যদিও জেনারেল নলেজ নিয়ে সব স্কুলেই কমবেশি চর্চা হয় তবুও বাবা-মা বা অভিভাবকদের এই বিষয়ে আরও জোর দেওয়া উচিত। সন্তানের জেনারেল নলেজ কীভাবে বাড়ানো যায় সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়।

খেলার প্রতি সব বাচ্চাই কমবেশি আকৃষ্ট। তবে একটা বিষয় হল জনপ্রিয় খেলাগুলি ছাড়াও বিভিন্ন খেলা সম্পর্কে বাচ্চাদের জানা দরকার। তাই অভিভাবকদের কাজ সন্তানকে বিভিন্ন খেলার গুরুত্ব বোঝানো। যেমন অলিম্পিকের খেলাগুলো শুধু বিনোদনের জন্য নয়, এর থেকে অনেক কিছু শেখারও রয়েছে। বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে জানতে পারবে বাচ্চারা। তাতে জেনারেল নলেজ বাড়বে। এইসব বিষয়গুলো তাদের মতো করে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে সেই বিষয়ে সে আকর্ষণ অনুভব করে। আর একটা ব্যাপার হল ধরুন সে যদি ভূগোল পড়ে, তবে পৃথিবী সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু বাচ্চাকে শেখাতে গ্লোব ও মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে। হাতে-কলমে বাচ্চাদের শেখানোটা খুব দরকার কারণ এতে তারা অনেক বেশি শিখতে পারে এবং বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারে। আর তাছাড়া বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেক আনুষঙ্গিক জিনিসও সে জানতে পারে এই পদ্ধতিতে।

প্রতিযোগিতার এই যুগে সাফল্য পেতে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনোই যথেষ্ট নয়। বাচ্চাদের বিভিন্ন ছোটোগল্পের বই ও ম্যাগাজিন পড়তে দিতে হবে। তাতে বাচ্চারা একটা মজার জগৎ পাবে। *এরপর দু'য়ের পাতায়*

জেনারেল নলেজ: দুই, ছয় ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায়
ক্লাস (সেভেন-টেন) টিউশন: চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

অর্কপ্রতিম চৌধুরী দশম শ্রেণি
মেদিনীপুর টাউন স্কুল

টিচারদের নির্দেশমতো টেক্সট বইগুলো বারবার পড়ি

মেদিনীপুর টাউন স্কুলের দশম শ্রেণির ফার্স্ট বয় অর্কপ্রতিম। রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ার শখ। সঙ্গে খেলাধুলো তো আছেই। এসব সামলেও পড়াশোনাতেই বেশ মনোযোগী। পড়াশোনা নিয়ে অনেক কথাই জানাল 'উত্তরণ'কে।

উত্তরণ: ফার্স্ট বয়-এর রহস্য?

অর্ক: আমার বাবা স্কুল টিচার। ছোট থেকে বাবা আমায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গাইড করত। মা-ও নজর রাখত। ছোট থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত বাবার কাছেই পড়তাম। ক্লাস এইটে ওঠার পর জীবন বিজ্ঞান আর অঙ্কের জন্য টিউশন নেওয়া শুরু করি। আর এখন ছ'টা সাবজেক্টের স্যার আছেন। বাড়ির স্যার, ম্যাম-রা এবং স্কুলের টিচাররা যেভাবে বলেন সেইমতো পড়াশোনা করি। বাবা তো আছেই।

উত্তরণ: দিনে কতটা সময় পড়াশোনা করো?

অর্ক: সকাল ছ'টায় উঠি। ছুটি থাকলে সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত পড়ি। তারপর আবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত পড়ি। আর স্কুল থাকলে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়ি। তারপর স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে একটু খেলাধুলো করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়ি। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত এগারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত পড়ি।

উত্তরণ: কোন বিষয়টা বেশি ভালো লাগে?

অর্ক: অঙ্ক আর বিজ্ঞান।

উত্তরণ: অপছন্দের বিষয়?

অর্ক: হ্যাঁ, আছে তো। ইতিহাস অনেক পড়তে হয়। তবে অবহেলা করি না।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

অর্ক: ডাক্তার, হার্ট স্পেশালিস্ট।

উত্তরণ: ডাক্তার তো বুঝলাম। কিন্তু হার্ট স্পেশালিস্ট কেন?

অর্ক: এখন অনেকেই হার্টের অসুখে মারা যাচ্ছেন। অল্প বয়সে অনেকের হার্টে ফুটো দেখা দিচ্ছে। তাই আমার ইচ্ছে হার্ট স্পেশালিস্ট হয়ে এই রকম রোগীদের চিকিৎসা করে তাদের পাশে থাকতে।

উত্তরণ: তোমার ইন্সপিরেশন?

অর্ক: প্রথমত, বাবা। ছোট থেকে বাবাকে অনুসরণ করে বড় হচ্ছি। তারপর দীপক স্যার, আমার জীবন বিজ্ঞানের স্যার।

উত্তরণ: ভালো রেজাল্ট করার জন্য কীভাবে পড়াশোনা করো?

অর্ক: স্কুলের টেক্সট বইগুলো ভালো করে পড়ি। এছাড়াও অন্য লেখকদের বইও ফলো করি।

উত্তরণ: সারাক্ষণ কি পড়াশোনা নিয়েই থাকো, নাকি অন্য কিছু করো?

অর্ক: আঁকতে ভালো লাগে। গল্পের বই পড়তেও ভালো লাগে। ক্রিকেট খেলতেও ভালো লাগে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, বিদিশা চক্রবর্তী**

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও কিছু ঘটনা

বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার আমাদের জীবনের বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। প্রতিনিয়ত চলার পথে আমরা যে যে জিনিসগুলির সাহায্য পেয়ে থাকি তার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে বিজ্ঞান যুক্ত। তাই মনুষ্যজীবনে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করবেন এবং তা মানুষের উপকারে যুগ যুগ ধরে কাজে লাগবে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার আমাদের করেছে আশীর্বাদপুষ্ট। কিন্তু সেই আবিষ্কার কিন্তু একদিনে হয়নি। বলা যায় এই যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরিক্ষার ফল। পরবর্তী দিনে সেই আবিষ্কারগুলি মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বেশ কয়েকটি জিনিস আবিষ্কারের পিছনে মজার ঘটনাও রয়েছে। তেমন ওই জিনিসগুলি আবিষ্কারের পর বেশ কিছু মজার ঘটনাও ঘটেছিল।

পেনিসিলিন বিজ্ঞানের একটি অন্যতম আবিষ্কার।

১) পেনিসিলিন কে আবিষ্কার করেছিলেন জানো?

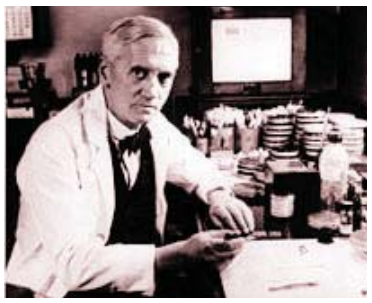

উত্তর: আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।

২) কত সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়?

উত্তর: ১৯২৮।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস:

ব্যাকটেরিয়া নিয়ে একটি গবেষণা করার সময় আলেকান্ডার ফ্লেমিং ছুটি কাটাতে বাইরে চলে যান। তিনি ঘরে ফিরে দেখেন একটি খাবারের প্লেট সিংকে পড়ে আছে এবং সেটিকে তিনি পরিষ্কার না করেই ফিরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ করেন যে পুরো প্লেটেই ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে একটি স্থান ছাড়া। গবেষণা করার পর তিনি জানতে পারেন ওই স্থানে কিছু রাসায়নিক পদার্থ রেখে গিয়েছিলেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর মজার ঘটনা কী ঘটেছিল?

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আলেকজান্ডারের পত্নী একজন গৃহকর্মী নিযুক্ত করেছিলেন যিনি ঘরের কাজ করতেন। যাতে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকে।

বিজ্ঞানের আরও একটি আবিষ্কার **অ্যানাস্থেশিয়া**।

১) অ্যানাস্থেশিয়ার আবিষ্কারকের নাম কী?

উত্তর: হোরাস ওয়েলস।

২) অ্যানাস্থেয়িার আবিষ্কার হয় কোন সালে?

উত্তর: ১৮৪৪

৩) কীভাবে হল অ্যানাস্থেশিয়ার আবিষ্কার?

বিদেশে কোনও পার্টিতে গেলে তখনকার দিনে নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে মানা ছিল। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষ তার নিজেদের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু একজন দন্ত চিকিৎসকের বন্ধু তার দেওয়া পার্টিতে নাইট্রাস অক্সাইড একটি বদ্ধ ব্যাগে নিয়ে আসে এবং একসময় ব্যাগের মুখটি খুলে দেয়।

অ্যানাস্থেশিয়া আবিষ্কারের পিছনে মজার ঘটনা কী ছিল?

বন্ধুটি একসময় বুঝতে পারে যে সে খুব বেশি ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। এরপর থেকেই অ্যানাস্থেশিয়ার জন্য নাইট্রাস অক্সাইড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়।

স্যাকারিন

১) কত সালে আবিষ্কার হয় স্যাকারিন?

উত্তর: ১৮৭৯।

২) স্যাকারিন আবিষ্কারকদের নাম কী?

উত্তর: কনস্টান্টিন ফালবার্গ ও ইরা রামসেন।

কীভাবে আবিষ্কার হয়েছিল স্যাকারিন?

পুরো একটি দিন একটি কয়লা খনিতে কিছু গবেষণা করবার পর ফালবার্গ জন হপকিন্স ল্যাবরেটরির দিকে রওনা হন এবং রাতের খাবারের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি এমন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করেন যা মিষ্টি ছিল এবং তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন যে এই দ্রব্যটির সঙ্গে একটি রাসায়নিক পদার্থ মিশে আছে যা তার হাতে লেগেছিল। তিনি সকালের কয়লা খনিতে গবেষণা করার কথা মনে করেন। তিনি পদার্থটিকে নিয়ে আরও কিছু গবেষণা করবার পর জানতে পারেন যে এখানে কোনও ক্যালরি নেই।

স্যাকারিন আবিষ্কারের পরে কী হয়েছিল?

ফালবার্গ রামসেনের নাম আবিষ্কারকের নাম থেকে কেটে দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে মিলিয়ন ডলার থেকে বঞ্চিত করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি গোপনীয়তার সঙ্গে আবিষ্কারটির পেটেন্টও জমা দেন।

আরও জেনারেল নলেজ ছয় ও আটের পাতায়

পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজন জেনারেল নলেজের দখল

প্রথম পাতার পর

সর্বোপরি আনন্দ পাবে আবার অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবে। আমরা এখন একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে। এখনকার প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে। বই পড়ে বাচ্চারা যতটা মনে রাখতে পারে, তারচেয়ে অনেক বেশি অডিও শুনলে বা ভিডিও দেখলে তাদের মনে গেঁথে যায়। তাই কোনও জটিল কিছু বোঝাতে অডিও বা ভিডিও ব্যবহার করতে হবে। এতে বাচ্চার জেনারেল নলেজ বাড়বে।

প্রতিদিনের সকাল শুরু মানেই খবরের কাগজ। আর খবরের কাগজ যে শুধু বড়দের জন্য তা কিন্তু নয়। এখনকার বাচ্চারা অনেক বেশি আপডেটেড। তাদের ছোট থেকেই সব বিষয়ে অল্প-বিস্তর ধারণা তৈরি হয়ে যায়। তাই এটা ভাববার কারণ নেই যে খবরের মানেই তা বাচ্চার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে। এমন ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চার মধ্যে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। সেখান থেকে একাধিক বিষয়ে জানতে পারবে আপনার বাচ্চা। খবরের কাগজ হল জেনারেল নলেজ বাড়ানোর অন্যতম সূত্র। আর টিভি মানেই খারাপ তা কিন্তু নয়। যদিও এখনকার বাচ্চাদের বেশিরভাগেরই ছোটবেলা থেকে টিভি দেখার অভ্যেস হয়ে যায়। টিভিতে বিভিন্ন সময় কুইজ শো হয়, সেগুলি বাচ্চাকে দেখান। সেই সঙ্গে কুইজ শো-তে অংশ নেওয়ার আগ্রহ তৈরি করুন বাচ্চার মধ্যে। কুইজ শো-তে অংশ নেওয়া খুব দরকার

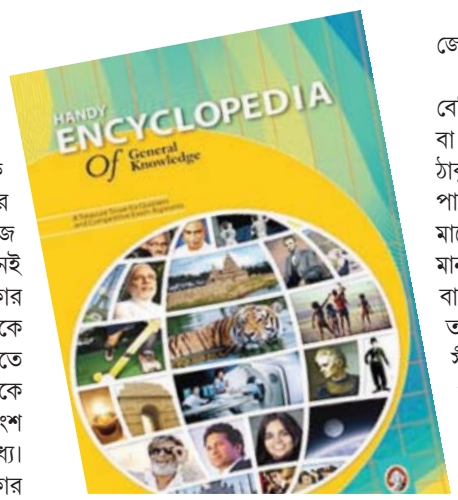

জেনারেল নলেজ বাড়ানোর জন্য।

একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে ভাঙতে এখন বেশিরভাগ পরিবারই নিউক্লিয়ার। তাই পুরাণ বা ইশপের গল্প শোনানোর জন্য সবসময় ঠাকুমা-দাদু যে পাওয়া যাবে তা নাও হতে পারে তবে ছোট্টবেলা থেকে এগুলো বাবা-মাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এই সব গল্প শুধু মানবিক মূল্যবোধই নয় জেনারেল নলেজও বাড়ায়। বাচ্চাকে ঘরকুনো করে রাখবেন না। তাতে বাচ্চার শিক্ষা কোথাও না কোথাও সীমিত হয়ে যেতে পারে। তাই আর পাঁচজনের সঙ্গে বাচ্চাকে মিশতে দিন। জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

বাচ্চারা একটু-আধটু ঘুরতেও ভালোবাসে। এতে পড়ার প্রতি মনোযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। সময় পেলে তাই বাচ্চাকে মিউজিয়ামে নিয়ে যান। ঘুরতে গিয়ে সন্তান খুশি হবে, আবার অনেক কিছু শিখতেও পারবে। আর সন্তানের জ্ঞান বাড়াতে নিয়মিত নানারকম প্রশ্ন করুন। তাতে বাচ্চার জানার ও শেখার আগ্রহ দুই-ই বাড়বে। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে খেলার ছলে বাচ্চার জেনারেল নলেজ বাড়াতে হবে। তাহলে এতে সেও মজা পাবে এবং আকৃষ্ট হবে। আর মাঝে মাঝেই তার জানা প্রশ্নগুলোকে জিজ্ঞেস করে তার সঠিক উত্তরে ইতিবাচক অভিব্যক্তি দেখিয়ে তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপারগুলো যেন তার ওপর জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া হয়।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান প্রতিটি পদের অর্থই প্রধান তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। ‘ও’, ‘এবং’, ‘আর’ ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন- দীন ও দরিদ্র= দীন-দরিদ্র। ছাই আর ভস্ম= ছাইভস্ম।

১) বিভিন্ন পদ-সমবায়ে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন- দুধ ও ভাত = দুধ-ভাত।

২) দুই বিশেষণ পদে দ্বন্দ্ব: ধনী ও দরিদ্র। কিন্তু দুটি বিশেষণ পদ একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে দ্বন্দ্ব সমাস হয় না। তখন তা কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন- কাঁচামিঠে- কাঁচা ও মিঠে হবে না। হবে কাঁচা অথচ মিঠে (কর্মধারয় সমাস) যেহেতু একই বস্তুকে বোঝাচ্ছে।

৩) অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: হাটে ও বাজারে= হাটে-বাজারে, দুধে ও ভাতে= দুধে-ভাতে।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনওটিরই অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে তাদের দ্বারা লক্ষিত বা উদ্দিষ্ট অন্য পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদগুলি সাধারণত বিশেষণ হয়। সংজ্ঞা বা নাম বোঝাতে বিশেষ্য হয়।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ:

১) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের এক বা একাধিক পদ লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। এই সমাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমানের সঙ্গে সমাস হয় বলে একে উপমাবাচক বহুব্রীহিও বলা হয়। যেমন: ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধার যার= ক্ষুরধার।

২) ব্যতিহার বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে একই রূপ দুটি বিশেষ্য থাকে এবং পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া বিনিময় বোঝায় তাকে ব্যতীহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এই সমাসে একটি পদের দ্বিত্ব হয়। সেই দ্বিরুক্ত পদের পূর্ব পদের শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ’আ’ এবং পরপদে ’ই’ যুক্ত হয়। যেমন: কেশে কেশে আকর্ষণ করে যে সংঘর্ষ= কেশাকেশি।

৩) সহার্থক বহুব্রীহি: সহার্থক পূর্বপদের সঙ্গে উত্তর পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে সহার্থক বহুব্রীহি বলে। যেমন: ক্রিয়ার সহিত বর্তমান: সক্রিয়।

৪) নঞর্থক বহুব্রীহি বা না-বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে নঞর্থক বা না বোধক অব্যয় থাকে এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি বলে। যেমন: নেই আদি যার= অনাদি।

নঞ-তৎপুরুষ ও নঞ-অর্থক বহুব্রীহি সমাস একই রকম দেখতে। অর্থ বুঝে ব্যাসবাক্য করতে হয়।

দ্বিগু সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য এবং সমাসবদ্ধ পদটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় তাকে বলে দ্বিগু সমাস। দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়। যেমন: সপ্ত অহের সমাহার= সপ্তাহ।

দ্বিগু সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়, বিশেষণ হয় না, আর পরপদের অর্থই প্রধান হয়।

নিত্য সমাস

সমস্যমান পদগুলির দ্বারা যে সমাসের ব্যাসবাক্য করা যায় না অর্থাৎ যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা ব্যাসবাক্য করতে হলে অন্য পদের প্রয়োজন হয় তাকে বলে নিত্য সমাস। যেমন: কৃষ্ণ-সর্প= কৃষ্ণ যে সর্প। মানে কালো রঙের সাপকে বোঝায়, কিন্তু কৃষ্ণ সর্প অর্থ কেউটে সাপ।

অনেক সময় ব্যাসবাক্যের জন্য স্বপদ অর্থাৎ সমাসের নিজের পদ ব্যবহৃত না হয়ে অন্য পদ ব্যবহৃত হয়, এই জাতীয় নিত্য সমাসকে অ-স্বপদবিগ্রহ নিত্য সমাস বলে। যেমন: অন্য দেশ= দেশান্তর।

অলোপ সমাস

যে সমাসে সমস্ত পদে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না সেই সমাসকে অলোপ সমাস বলে। অলোপ সমাস কোনও পৃথক সমাস নয়। দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি প্রভৃতি সমাসের অন্তর্গত অলোপ সমাস। যেমন: ক)অলোপ দ্বন্দ্ব: হাটে ও বাজারে= হাটে-বাজারে। খ) অলোপ তৎপুরুষ: হাতে-কাটা= হাত দিয়ে কাটা। গ) অলোপ বহুব্রীহি: গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে: গায়ে-হলুদ।

বাক্যাশ্রয়ী সমাস

বাক্যকে আশ্রয় করে যে সমাস গঠিত হয় তাকে বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলে। যেমন: বসে আঁকার প্রতিযোগিতা= বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

পরের সংখ্যায় থাকবে ‘পদ’।

পরামর্শ: বাবা-মায়ের জন্য

সন্তানের সামনে সংযত আচরণ

বৃষ্টি ঘোষ

প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই তাঁর সন্তান এক অমূল্য সম্পদ। তাই নিজের সবটুকু দিয়েই আমরা সন্তানকে লালন-পালন করে থাকি। সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করতে, একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। নিজের সাধ্যের মধ্যে কিংবা সাধ্যের বাইরে গিয়েও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আমরা পৌঁছে দিতে চাই আদরের সন্তানটির কাছে। কিন্তু কখনও কী ভেবে দেখেছেন যে নিজের অজান্তেই আমরা অনেক সময় অনেক খারাপ কিছুও সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি? কিংবা আমাদের আচরণের কারণে সে শিখে নিচ্ছে কিছু ঋণাত্মক জীবনভঙ্গি?

যেমন ধরুন, আপনার শিশুটি হয়তো খেলছে, অথচ পাশেই চলছে অন্যের সমালোচনা। কিংবা সন্তানের সামনেই জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চলছে আপনার ঝগড়া। আড্ডায় উঠে আসছে প্রতিবেশীকে নিয়ে নানা রসালো মন্তব্য, ফোনে বলছেন অশালীন কথা অথবা খাবার টেবিলে বসে ধকম দিচ্ছেন কাজের মানুষকে। আসলে আমরা না বুঝেই ছোটদের সামনে এমন অনেক আচরণ করে থাকি, যা করা একেবারেই অনুচিত। বড়রা বেশিরভাগ সময়ই খেয়াল করেন না যে ছোটরা খুব সহজেই এসব আচরণ ফলো করে ও গ্রহণ করে।

শিশুদের সামনে হয়তো অনেকক্ষণ ধরে রোজ টিভি দেখা হয়। প্রায় সময়ই দেখা যায় সেগুলি শিশুদের জন্য ঠিক নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের এই নানা অনুষ্ঠান, নাটক ছোটদের সহজেই প্রভাবিত করে। মারামারির দৃশ্য, হিংসা, মিথ্যা বলা থেকে শুরু করে আপত্তিকর দৃশ্য ছোটদের সহজেই আকর্ষিত করে। ফলে ক্রমশ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেভাবেই গড়তে শুরু করে। তাই বলে পরিবারের লোকজন টিভি দেখবে না তা নয়, শিশুরা যখন ঘুমোবে তখন দেখুন কিংবা তার সামনে এমন অনুষ্ঠান দেখুন যেগুলি তার কোমল হৃদয়ে ভালো প্রভাব ফেলবে। যেমন গানের অনুষ্ঠান, নাচ-গানের রিয়ালিটি শো ইত্যাদি।

শিশুদের সামনে কখনও বাড়ির কাজের লোককে গালিগালাজ বা মারধর করবেন না। এতে শিশুটি তা শিখে ফেলবে। হিংস্রতা তার চরিত্রে ঢুকে পড়বে। দেখা গেল, গালিটি সে রপ্ত করে পরে আপনাকেই দিতে শুরু করল। আসলে শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা ভালোমন্দ বিচার করতে পারে না। সেকারণে ওদের সামনে সব কথা নম্রভাবে বলুন। আপনি যা বলবেন সে তাই বিশ্বাস করবে। তাই এইসব বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সবার বিশেষ করে মা-বাবার সচেতন থাকা উচিত।

কখনোই শিশুর সামনে কারও সমালোচনা করবেন না। সন্তান হয়তো পাশে খেলছে, আপনি বসে গল্প করছেন কিংবা ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন, সে সময় কাউকে নিয়ে কটূক্তি বা বাজে মন্তব্য করবেন না। আপনি ভাবতে পারেন এখনও আপনার সন্তানের এসব বোঝার বয়স হয়নি। কিন্তু এই ভুল ধারণা ত্যাগ করুন। শিশুরা পাঁচ বছর বয়স থেকেই মোটামুটি সব বুঝতে শেখে। সম্পূর্ণটা না বুঝলেও তারা আঁচ করতে পারে। তাই আপনি কাউকে নিয়ে কটূক্তি করলে এতে তার সেই ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে এবং হতে পারে সেই ব্যক্তির সামনেই আপনার সন্তান না বুঝে তাঁকে খারাপ কিছু বলে দিল। এতে আপনিই বিব্রত হবেন। তাই সন্তানের অনুপস্থিতিতে একান্ত কথা বলুন।

বিশেষ দিনে বা অনুষ্ঠানে আমরা প্রায়ই উপহার পেয়ে থাকি। পছন্দ না হলে বা না

ভেবেই আমরা তা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করি। পরে দেখা যায় শিশুটিরও এই ধরনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এবং বড়দের সামনেই তারা তা বলেও ফেলে। তখন কিন্তু বাবা-মা উলটে তাকে শাসন করেন। তাদের নিজেদের কারণেই যে সন্তান এসব শিখেছে তা অভিভাবকরা একবারও ভেবে দেখেন না। তাই উপহার পছন্দ না হলে এ নিয়ে খারাপ মন্তব্য করবেন না। প্রয়োজনে উপহারটি সরিয়ে রেখে দিন অন্য সময় ব্যবহারের জন্য। সন্তানকে শেখাবেন, মন থেকে দেওয়া উপহার কখনও খারাপ হয় না। অপ্রয়োজনীয় মনে হলে তা ব্যবহার না করলেই হল।

বাবা-মার মধ্যে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হলে তা শিশুর সামনে প্রকাশ না করাই ভালো। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ঘরের দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে নীচু গলায় করা উচিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সমালোচনা সন্তানের সামনেই করেন। এতে তাদের সম্পর্কে সন্তানের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে সে আপনাকে দোষারোপ করতে একবারও ভাববে না।

প্রতিবেশীকে নিয়ে কোনও কথা সন্তানের সামনে বলবেন না। সেই পরিবার বা ব্যক্তিটি সম্পর্কে তার মনে মন্দ ধারণা জন্ম নেবে। পরবর্তীতে সে তাকে শ্রদ্ধা করবে না। সুতরাং কোনও নেতিবাচক আচরণ বা কথা শিশুর সামনে বলা চলবে না। এছাড়া, শিশুদের সামনে অন্যকে অবহেলা, উপেক্ষা বা অন্যের সাফল্যকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। এসব আচরণ সে রপ্ত করে ফেলবে। শিশুটির মধ্যে মানবিকতা কমে যাবে। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। তাই অন্যের সামাজিক, সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজের প্রশংসা করুন ওর সামনে।

মনে রাখবেন, আপনার ছোট ছোট আচরণের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সন্তানের সঠিক বিকাশ হবে। এজন্য প্রয়োজন আরেকটু মাত্র সচেতনতা।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

জলদূষণ

জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া একমুহূর্ত আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এই জল নানা কারণে দূষিত হয়ে আমাদের জীবনে নানারকম ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সেই জলদূষণ ও তার প্রতিরোধ।

জলে নানারকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক, জীবাণু, জৈব পদার্থ মিশে যখন তা মানুষ ও পশুপাখির ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের অনোপযোগী হয়ে ওঠে, তখন জল দূষিত হয়।

ভারত নদীমাতৃক দেশ। সেই ভারতের প্রাণ গঙ্গা নদী গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন কারণে দূষিত হচ্ছে। এই নদীর দুই তীরে অসংখ্য কলকারখানা, শহর, নগর, জনবসতি, গড়ে ওঠার ফলে সেখানকার বিষাক্ত আবর্জনা নদীর জলে গিয়ে মিশে নদীর জলকে দূষিত করে তুলেছে। কাবেরী, গোদাবরী, যমুনা প্রভৃতি নদীগুলিরও একই অবস্থা। ভারতের মতো পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই যেমন আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে বিশুদ্ধ জলের সংকট দেখা গেছে। যার মূল কারণই হল জলদূষণ ও জলের অতিরিক্ত ব্যবহার। পৃথিবীর মোট ১০০ ভাগ জলের ৯৭ ভাগ সমুদ্রের নোনা জল। বাকি তিন ভাগ স্বাদু জলের দুই ভাগ হিমবাহের বরফ হিসাবে আছে, বাকি এক ভাগ স্বাদু জল নদী, জলাশয়, ও ভূগর্ভের জল। এর থেকে বোঝা যায় ব্যবহারযোগ্য জল কত দুর্লভ।

জলদূষণের কারণ:

১) **শিল্প কারখানা থেকে জলদূষণ:** পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প, পলিথিন-প্লাস্টিক শিল্প, জ্বালানি শিল্প, খনিজ তেল পরিশোধন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও বিভিন্ন যানবাহন

নির্মাণ শিল্প কারখানা থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ যেমন— অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, ফেনল, সায়ানাইড, জিঙ্ক, পারদ, সিসা প্রভৃতি নালা, নর্দমা দিয়ে নদী বা সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করে।

২) **গৃহস্থালি থেকে জলদূষণ:** রোজকার জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন বস্তু যেমন রান্না করা খাবারের টুকরো, সাবান, ফিনাইল নিকাশি নালার মাধ্যমে নদীর জলে মিশে জলকে দূষিত করে তোলে।

৩) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে দূষণ:** পারমাণবিক চুল্লি, চিকিৎসাকেন্দ্র বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি ব্যবহারের পর সমুদ্রে বা নদীতে ফেলা হয়, যা জলকে দূষিত করে।

৪) **খনিজ তেল থেকে দূষণ:** অনেক সময় দেখা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্থ তেলবাহী জাহাজ থেকে বা সমুদ্রে অবস্থিত তেলের খনির তেল সমুদ্রের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়।

৫) **কৃষিক্ষেত্র থেকে দূষণ:** চাষের জমিতে যে সমস্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে ভূগর্ভের জলে, জলাশয়ে, নদীতে মিশে জলকে দূষিত করে।

৬) **তাপীয় দূষণ:** তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উষ্ণ, দূষিত বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে-জলাশয়ে মিশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে জলদূষণ ঘটায়।

৭) **বায়ুদূষণের কারণে জলদূষণ:** কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ার মাধ্যমে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড জমা হয়। পরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড হয়ে ভূপৃষ্ঠের জলকে দূষিত করে।

৮) **আর্সেনিক দূষণ:** মাটির নীচের জলস্তর কমে গেলে ফাঁকা অংশে আর্সেনিক বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করে। এই যৌগ নলকূপের জলের মাধ্যমে পানীয় জলে মিশে জলকে দূষিত করে।

জলদূষণের কারণে হওয়া কিছু দুর্ঘটনা:

১৯৩২ সালে জাপানে মিনামাটা উপসাগরের উপকূলে একটি রঙের কারখানা থেকে পারদযুক্ত তরল বর্জ্য সমুদ্রে ফেলার ফলে পারদ দূষণে অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তু মারা যায়।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কুয়েতে প্রচুর তেলের কূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তার ফলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করে এবং অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার মাটির তলায় অতিমাত্রায় আর্সেনিক থাকার ফলে সেখানকার মানুষের হাতের চেটো ও পায়ের তলায় কালো একধরনের ক্ষত দেখা যায় যাকে 'ব্ল্যাকফুট' ব্যাধি বলে। এছাড়াও ত্বকের ক্যানসার, চর্মরোগ, রক্তাল্পতা হতে পারে। ফ্লুরাইড দূষণ থেকে ফ্লুরোসিসও হতে পারে।

জলদূষণ প্রতিরোধ

জলের অপচয় রোধ করে জলদূষণ কমানোর দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত, তা না হলে পৃথিবীব্যাপী মানুষকে তীব্র জলসংকটের সম্মুখীন হতে হবে। যে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে তা হল—

নদী বা সমুদ্রের জলে আবর্জনা না ফেলা, কাপড় কাচা, জীবজন্তু স্নান না করানো, শহর ও কলকারখানার দূষিত জল শোধন করে তবেই নদী বা সমুদ্রে ফেলা বা পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, চাষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা, তাপবিদ্যুৎ বা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য উষ্ণ জল ঠান্ডা করে তবেই সমুদ্র বা নদীতে ফেলা, নলকূপের জলের দূষণ রোধ করার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে তবেই তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: বিজ্ঞান

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

সমস্ত বস্তুই কোনও না কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থের ভর, ওজন আছে, আয়তন আছে, একে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এবং এর স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলে বাধা দেয় অর্থাৎ জাড্যধর্ম বর্তমান।

ভৌত অবস্থা অনুযায়ী তিন প্রকারের পদার্থ দেখা যায়— কঠিন (যেমন, লোহা, কাঠ, বরফ, কয়লা, চুনা পাথর ইত্যাদি), তরল (যেমন, জল, তেল, গ্লিসারিন, কেরোসিন, দুধ, পেট্রোল ইত্যাদি) এবং গ্যাসীয় পদার্থ (যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি)। প্রধানত পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণের তারতম্যের কারণেই পদার্থের তিন রকম অবস্থা দেখা যায়।

তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন জলের কঠিন অবস্থা হল বরফ। তাপের প্রভাবে বরফ গলে তরল জলে পরিণত হয়। আরও তাপের প্রভাবে জল গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক: নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থ যে তাপমাত্রায় গলে তরলে পরিণত হয়, তাকে ওই কঠিনের গলনাঙ্ক বলে। আবার নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি বিশুদ্ধ তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে গ্যাসে পরিণত হয় তাকে ওই তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে। নীচে তালিকা করে কয়েকটি পদার্থের প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হল।

পদার্থের ধর্ম: আমাদের চারপাশের অসংখ্য কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রতিটির ধর্ম অন্যটির থেকে আলাদা। প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যর জন্যে একটি পদার্থকে অন্য আর একটি পদার্থ থেকে আলাদা করে চেনা যায়, পদার্থের সেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পদার্থের ধর্ম বলে।

পদার্থের ধর্মগুলো প্রধানত দুই প্রকার:

ক) **ভৌত ধর্ম:** পদার্থের যেসব বিশেষ বাহ্যিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে তাদের ভৌত ধর্ম বলে। যেমন, ভৌত অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, চৌম্বক ধর্ম, দ্রাব্যতা, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদি। এই ধর্মগুলোর দ্বারা শুধুমাত্র পদার্থের বাহ্যিক অবস্থার ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, পদার্থটির অভ্যন্তরীণ আণবিক গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পদার্থটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না তা এই ধর্ম দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। পদার্থের এই ধর্মগুলিকেই বলে পদার্থের ভৌত ধর্ম।

বিভিন্ন পদার্থকে তাদের কিছু বাহ্যিক ধর্মের জন্যে আলাদা করে চেনা যায়। গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, চৌম্বক ধর্ম দিয়ে বিভিন্ন পদার্থকে চেনা যায়। যেমন, লোহা আর কাঠের টুকরোর স্পর্শ আলাদা। আবার অ্যামোনিয়ার গন্ধ ঝাঁঝালো, আর হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের মতো। চিনি, নুন জলে

কঠিন পদার্থ	গলনাঙ্ক (°c)	তরল পদার্থ	স্ফুটনাঙ্ক (°c)
বরফ	০	জল	১০০
খাদ্যলবণ	৮০১	পারদ	৩৫৭
অ্যালুমিনিয়াম	৬৫৯	ক্লোরোফর্ম	৬১
তামা	১০৮৩	ইথাইল অ্যালকোহল	৭৮
সোনা	১০৬৩	ইথার	৩৫
রুপো	৯৬২	বেঞ্জিন	৮০.১
জিংক	৪২০	অ্যাসিটোন	৫৬
লোহা	১৫৩০	সালফিউরিক অ্যাসিড	৩৩৮

দ্রবীভূত হয় কিন্তু কেরোসিনে দ্রবীভূত হয় না। অন্যদিকে কর্পূর কেরোসিনে সহজেই দ্রবীভূত হয়।

লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা গেলেও কাঠের টুকরোকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। আবার বলা যায় লোহাকে চুম্বক আকর্ষণ করে কিন্তু কাঠকে করে না।

খ) **রাসায়নিক ধর্ম:** পদার্থের যে ধর্ম পদার্থটির অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রবণতা ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে পদার্থটির রাসায়নিক ধর্ম বলে।

যেমন তড়িৎ প্রবাহের ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়, এটি জলের রাসায়নিক ধর্ম। আবার সালফারকে বাতাসে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটি সালফারের রাসায়নিক ধর্ম। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে জিংক ধাতুর টুকরোর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, এটি জিংকের রাসায়নিক ধর্ম।

অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন আসে। তার থেকে পদার্থের শনাক্তকরণ সম্ভব। যেমন, নুন আর চিনি একরকমের দেখতে। তাদের ভৌত ধর্ম স্বাদ দিয়ে তাদের শনাক্তকরণ সম্ভব। কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম দিয়ে শনাক্ত করতে চাইলে দুটো পদার্থকে আলাদা আলাদা ভাবে উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে চিনি বাদামি রং ও আরও উত্তাপে কালো হয়ে যাবে আর নুনে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। একটু জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারে।

৫
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

ভারতের সম্পদ

মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তার বিভিন্ন উপাদানকে নিজের বুদ্ধি আর শক্তির সাহায্যে রোজকার জীবনে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। তখন সেই উপাদানকেই বলে সম্পদ। যেমন— জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না তেমনি জল আমাদের ঘরের নানা কাজেও ব্যবহৃত হয়। বস্তুকে সম্পদ বানাতে মানুষের ভূমিকা অনেক, যেমন চাকা মানুষ প্রথমে আবিষ্কার করে কিন্তু পরে তা পরিবহনের কাজে লাগে। অর্থনৈতিক ভূগোলে তাই বস্তুকে বা তার কার্যকারিতাকে বা গুণকে সম্পদ বলা হয়। তাই কয়লা যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ তা আমাদের সম্পদ না, কিন্তু যখনি তা উত্তোলন করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয় তখনি তা সম্পদ হয়ে যায়। অধ্যাপক ই. ডব্লু. জিমারম্যান-এর মতে, 'সম্পদ হল কোনও দ্রব্য বা বস্তুর সেই বিশেষ গুণ, যা মানুষের অভাব মেটায় বা চাহিদা পূরণ করে।'

সম্পদের শ্রেণিবিভাগ: সম্পদ-এর গঠনগত উপাদান, তার স্থায়িত্ব, সহজলভ্যতা, অনুভূতি ও মালিকানা অনুযায়ী একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

সম্পদ: ১) উপাদান অনুসারে সম্পদের উপাদান অনুসারে আবার তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—

ক) প্রাকৃতিক: যে সম্পদ আমরা প্রকৃতি থেকে পাই যেমন জল, সূর্যের আলো।

খ) মানব: মানুষ তার বুদ্ধি ও বলের সাহায্যে অনেক কিছু করে তাই এটিও তার সম্পদ।

গ) সাংস্কৃতিক সম্পদ: মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা এই সম্পদ।

২) প্রাপ্যতা অনুসারে প্রাপ্যতা অনুসারে সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) অফুরন্ত সম্পদ: যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ কোনওদিন শেষ হবে না, যেমন— জল, সূর্যের আলো ইত্যাদি।

খ) অপুনর্ভব সম্পদ: যে সম্পদ প্রকৃতিতে সীমিত, যেমন— কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি।

৩) স্থায়িত্ব অনুসারে: স্থায়িত্ব অনুসারে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) সর্বত্র প্রাপ্ত সম্পদ: যে সম্পদ পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায়, যেমন— জল, সূর্যালোক ইত্যাদি।

খ) সাধারণ সম্পদ: যে সম্পদ সহজে পাওয়া যায় কিন্তু সব জায়গায় না, যেমন— মাটি, জল ইত্যাদি।

গ) দুষ্প্রাপ্য সম্পদ: যে সম্পদ কোনও বিশেষ স্থানে সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন— সকল প্রকার খনিজ।

৪) অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে অনুভবজাত সম্পদ দুই প্রকার হয়—

ক) বস্তুগত সম্পদ: যে সম্পদের আকার, ওজন ইত্যাদি গুণ স্পর্শ করে অনুভব করা যায়। যেমন— কয়লা।

খ) অবস্তুগত সম্পদ: যে সম্পদ স্পর্শে অনুভব করা যায় না, যেমন— জ্ঞান, বুদ্ধি।

৫) মালিকানা অনুসারে মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

ক) ব্যক্তিগত সম্পদ: যে সম্পদের মালিকানা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির, যেমন— চাষের জমি, বাড়ি।

খ) জাতীয় সম্পদ: যে সম্পদ সেই দেশের সব মানুষ ভোগ করে, যেমন— নদী,বন ভূমি।

গ) আন্তর্জাতিক সম্পদ: যে সম্পদ গোটা পৃথিবীর মানুষ ভোগ করে, যেমন— সমুদ্র, মহাকাশ।

সম্পদ সংরক্ষণ: সম্পদ সংরক্ষণ করার মানে হল সম্পদ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা যদি এখন থেকে এই ব্যাপারে সচেতন না হই তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সম্পদের পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। সম্পদ কে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সময়মতো তা আবার নতুন করে তৈরি হতে পারে। এক কথায় চাহিদার সঙ্গে ব্যবহারের ভারসাম্য রাখা উচিত। যেমন— কাগজ তৈরিতে যে পরিমাণ গাছ কাটা হয় সেই পরিমান লাগানো হয় না। কিন্তু পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া চালু করলে গাছ কাটা কমানো যেতে পারে। তেমনি বিদ্যুতের অপচয় কমালে কয়লার সংরক্ষণ সম্ভব।

পড়ুয়াদের কর্তব্য: এই দেশের সম্পদ আমাদেরই সম্পদ তাই একে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের, তাই কিছু জিনিসের দিকে পড়ুয়াদের নজর দেওয়া দরকার। যেমন— ঘর ছাড়ার আগে লাইট ফ্যান ঠিকমতো বন্ধ করা। জলের কল মনে করে বন্ধ করা যাতে জলের অপচয় কম হয়। গাছ লাগানো ও গাছের যত্ন নেওয়া। কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ ব্যবহার ও তার সংরক্ষণ যদি না করা হয় অদূর ভবিষ্যতে তা শেষ হতে বাধ্য।

খনিজ সম্পদ: খনিজ সম্পদ হল পুরোপুরি প্রকৃতির দান, মানুষ তার বুদ্ধি ও বলের সাহায্যে তাকে ব্যবহারের উপযোগী বানিয়ে তুলেছে। আমাদের দেশ ভারত খনিজ সম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এখানে নানারকম খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। তবে প্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে খনিজের প্রকার ভেদগুলো।

ভারতের খনিজ সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়— ১) জ্বালানি খনিজ, যেমন— কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি। এই সম্পদগুলোকে শক্তি সম্পদও বলা হয়। ২) ধাতব সম্পদ— তামা, টিন, আকরিক লোহা ইত্যাদি এই জাতীয় সম্পদ। এবং ৩) অধাতব সম্পদ— সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

বংশগতি

বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলি মা-বাবার থেকে অপত্যের মধ্যে অর্থাৎ এক প্রজন্ম বা জনু থেকে পরবর্তী প্রজন্ম বা জনুতে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হওয়াকেই বংশগতি বলে।

বংশগতির কারণেই, জননের মাধ্যমে মা-বাবার অর্থাৎ জনিতৃ জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্ম বা সন্তান বা অপত্য জীবদের দেহে সঞ্চারিত হয়। প্রাণিজগতে যেমন সন্তানের নাক, চোখ, চুলের রং, গায়ের রং, মুখের গড়ন, উচ্চতা, হাত ও পায়ের গড়ন ইত্যাদিতে সাধারণত মা-বাবার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তেমন উদ্ভিদজগতেও একটি চারাগাছের পাতা, ফুল, ফুলের গন্ধ, ফল ইত্যাদির মধ্যে বংশগতির ধারা লক্ষ করা যায়। এছাড়াও হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা, থ্যালাসেমিয়া, ডায়াবেটিসের মতো কিছু রোগ-ব্যাধিও বংশগতির কারণে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। তবে সন্তানের মধ্যে অনেক সময়ে মা-বাবার থেকে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলির কোনগুলি অপত্যের মধ্যে বর্তাবে আর কোনগুলি বর্তাবে না সেই বিষয়ে পড়াশোনাই হল বংশগতিবিদ্যা।

বংশগতিবিদ্যার জনক হলেন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মটর গাছের উপর করা গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী দ্য ভ্রিস, সেরম্যাক ও কোরেন্স মেন্ডেলের সূত্রগুলির সত্যতা যাচাই করেন ও মেন্ডেল তত্ত্বের আবার প্রতিষ্ঠা করেন।

বংশগতির সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমেই তোমাদের কিছু শব্দের ব্যবহার জানতেই হবে।

বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ: জিন দ্বারা নির্ধারিত জীবের প্রকাশিত ফিনোটাইপ হল বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ। যেমন মটর গাছের খর্বকায় দেহাকৃতি হল একটি বৈশিষ্ট্য।

অ্যালিল: হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট লোকাসের সম বা বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন দুটির একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে।

লোকাস: ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে।

জিন বা ফ্যাক্টর: জিন DNA-র অংশবিশেষ যা একটি পলিপেপটাইড গঠনের মাধ্যমে জীবের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে এবং বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞানী মেন্ডেল একেই ফ্যাক্টর বলেছেন এবং বিজ্ঞানী জোহানসেন একে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জিন নাম দেন।

ক্রোমোজোম: ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থানকারী স্বপ্রজননশীল, নিউক্লিওপ্রোটিন নির্মিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সুতোর মতো অংশগুলি জিন বহন করে, তাদের ক্রোমোজোম বলে।

মিউটেশন: জিন বা ক্রোমোজোমের বংশগতভাবে সঞ্চরণশীল স্থায়ী পরিবর্তন হল মিউটেশন। জিনের আকৃতিগত ও গঠনগত পরিবর্তন হল জিন মিউটেশন। মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্য হল মিউট্যান্ট। ক্রোমোজোমের আকৃতিগত পরিবর্তন ও কোনও ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমে জিনের সজ্জার পরিবর্তন হল ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন। জিনোম সেটের স্তরের মিউটেশনে ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা তিন বা তার বেশি হয়। কখনও একটি বা তার বেশি ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে।

প্রকরণ: প্রতিটি জিন নির্দিষ্ট ফিনোটাইপের সাহায্যে তার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ করে। একটি জিনের মিউটেশনের ফলে একাধিক অ্যালিল তৈরি হয়, ফলে একটি বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন প্রকারভেদের সৃষ্টি হয়। বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি প্রকারভেদের জন্য এক একটি অ্যালিল দায়ী। একে প্রকরণ বলে।

একসংকর জনন: একজোড়া বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও একই প্রজাতিভুক্ত দুটি বিশুদ্ধ জীবের সংকরায়ন ঘটানোর পদ্ধতি হল একসংকর জনন।

দ্বি-সংকর জনন: দু'জোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও একই প্রজাতিভুক্ত দুটি জীবের সংকরায়ন ঘটানোর পদ্ধতি হল দ্বি-সংকর জনন।

সমসংকর বা হোমোজাইগাস: জাইগোটের একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের কোনও নির্দিষ্ট লোকাসে যদি একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (সমধর্মী) জিন (অ্যালিল) অবস্থান করে, তখন সেই জাইগোটকে হোমোজাইগোট বলে আর হোমোজাইগোট থেকে সৃষ্ট জীবকে বলে হোমোজাইগাস বা সমসংকর জীব বলে।

বিষমসংকর বা হেটেরোজাইগাস: জাইগোটের একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের কোনও নির্দিষ্ট লোকাসে যদি পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (বিষমধর্মী) জিন (অ্যালিল) অবস্থান করে, তখন সেই জাইগোটকে হেটেরোজাইগোট বলে আর এর থেকে সৃষ্ট জীবকে বলে হেটেরোজাইগাস বা বিষমসংকর জীব বলে।

সংকরায়ণ: বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতিভুক্ত দুটি জীবের মিলনকে সংকরায়ণ বলে।

বিশুদ্ধ জীব: একটি ডিপ্লয়েড জীবের কোনও নির্দিষ্ট হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের কোনও নির্দিষ্ট লোকাসে যদি পরস্পর একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন অবস্থান করে, তখন ওই জিনটির সাপেক্ষে জীবটিকে বলে বিশুদ্ধ জীব।

সংকর জীব: একটি ডিপ্লয়েড জীবের কোনও নির্দিষ্ট হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের কোনও নির্দিষ্ট লোকাসে পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন বা অ্যালিল অবস্থান করলে ওই জিনটির সাপেক্ষে জীবটিকে বলে সংকর জীব।

জনিতৃ জনু: সংকরায়ণের সময় মা-বাবাই হল জনিতৃ জনু।

অপত্য জনু: জনিতৃ জনুর সংকরায়ণে সৃষ্ট জীবগুলি হল প্রথম অপত্য জনু বা First Filial Generation বা F1 জনু। সংকরায়ণে সৃষ্ট পরবর্তী জীব হল দ্বিতীয় অপত্য জনু বা Second Filial Generation বা F2 জনু।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

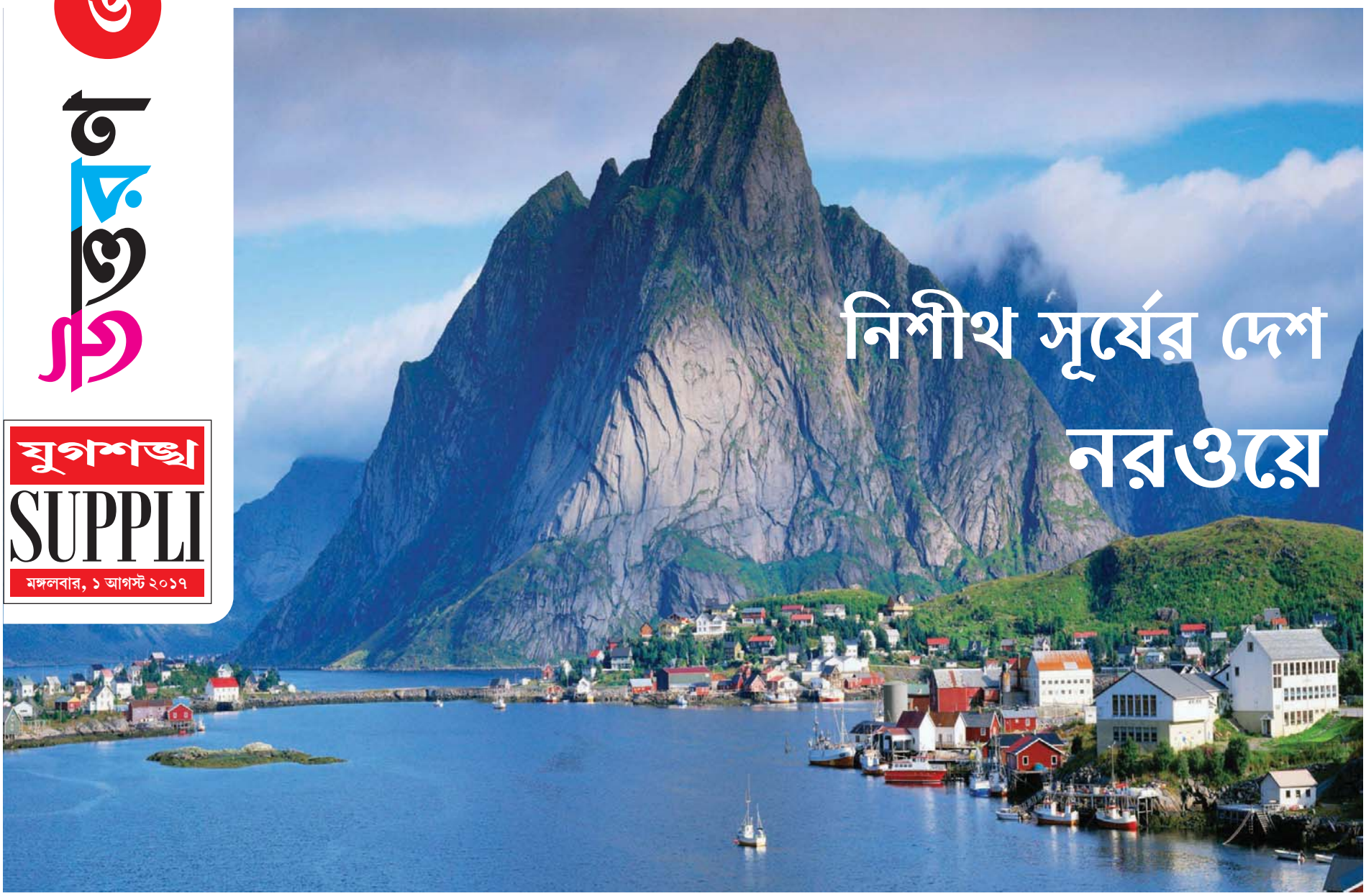

নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ে

নরওয়েকে বলা হয় নিশীথ সূর্যের দেশ। কারণ গোটা গ্রীষ্মকাল ব্যাপী নরওয়ের কিছু অংশে রাতেরবেলাতেও সূর্য দৃশ্যমান থাকে। ইউরোপের রাজতান্ত্রিক দেশ নরওয়ে। মধ্যরাতেও এখানে সূর্যের দেখা মেলে। বিশ্বজুড়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটির পরিচিতি 'নিশীথ সূর্যের দেশ' হিসেবে। নরওয়ের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর হল অসলো।

নরওয়েতে উত্তর গোলার্ধের গরমে কয়েক মাস সূর্য অস্ত না গিয়ে সবসময়ই আকাশ আলোকিত রাখে, আবার শীতকালে কয়েক মাস সূর্য ওঠেই না। আর তখন প্রায়ই উত্তরের আলো বা 'অরোরা বোরিয়ালিস' দেখা যায়। ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত নরওয়ের রাজধানী অসলোয় জুন-জুলাই মিলিয়ে দু'মাস সবসময় দিনের আলো থাকে। অর্থাৎ এ সময়ে এখানে সূর্য কখনও সম্পূর্ণ অস্তমিত হয় না। এর ফলে এ সময় রাত্রিবেলা অন্ধকারের পরিবর্তে গোধূলীর আলো বজায় থাকে। অসলো শহরটি দেশটির প্রায় দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। আরও উত্তরে ৭২ ডিগ্রি অক্ষাংশে এ সময় অনেকদিন পর্যন্ত সূর্যালোক থাকে। শুধু অসলো নয়, প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত সুইডেনের স্টকহোম বা ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে ও রাশিয়ার বহু অঞ্চলে এর কাছাকাছি এই রকম ঘটনা দেখা যায়। তবে বিশ্বজুড়ে নরওয়েই মধ্যরাতের সূর্যের দেশ হিসাবে চিহ্নিত।

নরওয়ে উত্তর মেরুর খুব কাছাকাছি অবস্থান করায়, গ্রীষ্মকালে সূর্য যখন উত্তর গোলার্ধে হেলে পড়ে, উত্তর মেরুতে সূর্য তখন সর্বক্ষণ দৃশ্যমান থাকে। মনে হয়, নিস্তেজ সূর্য যেন দিগন্তরেখা ঘেঁসে খুব নীচ দিয়ে অতিক্রম করছে। সূর্যের আলো তখন তীব্র ঝাঁঝালো হওয়ার পরিবর্তে হালকা নীলাভ আকার ধারণ করে। সূর্য প্রায় ৬ মাস দিগন্তরেখা বরাবর ঘুরতে থাকে, ফলে এই ছ'মাসে সূর্য কখনোই অস্ত যায় না। আর এ কারণে নরওয়েকে বলা হয় নিশীথ সূর্যের দেশ! পূর্ণিমার সময় এই কারণে দিনদুপুরে মাথার উপরে থাকে বিশাল চাঁদ। সূর্যের আলো ক্ষীণ, চাঁদের রশ্মিও ক্ষীণ। দুই ক্ষীণ ঘনিয়ে আসে অন্ধকার।

সুইডেন, নরওয়ে আর ফিনল্যান্ড পাশাপাশি দেশ। সুইডেনের উত্তর অংশের সঙ্গে দেশ তিনটি প্রায় একে-অপরের সঙ্গে লাগানো। একেবারে উত্তরে আবার নরওয়ের সঙ্গে ফিনল্যান্ডের সীমানা রয়েছে। এরপরই রয়েছে ব্যারেন্টস সাগর (Barents Sea), এরও উত্তরে রয়েছে সুমেরু মহাসাগর (Arctic Ocean)। আসলে এটি ঘন বরফের মহাসাগর। এই উত্তর মেরুর কাছাকাছি আবার রাশিয়া, কানাডা, গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক)- পরস্পরের সঙ্গে সীমানা রয়েছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশের দূরত্ব খুবই সামান্য।

সুইডেনের এক অংশে হয়তো দিনের দৈর্ঘ্য ১৬ ঘণ্টা, অথচ অন্য অংশে তখন দিনের দৈর্ঘ্য হয় ২২ ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি। এসব দেশে আসলে দুটো ঋতু প্রাধান্য পায়— শীত ও গ্রীষ্ম। বাকি দুটো ঋতু— বসন্ত এবং হেমন্ত থাকে মাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্য।

প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এখানে এই আশ্চর্য অলৌকিক মহাজাগতিক দৃশ্য দেখার জন্য আসেন। রাতে সূর্যের আলো দেখা সত্যিই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর অক্ষরেখা তার সমতলের ২৩.৫ ডিগ্রি ঝুঁকে যাওয়ার ফলে প্রতিটি গোলার্ধ গ্রীষ্মকালে সূর্যের দিকে হেলে যায়, আবার শীতকালে সেখান থেকে সরে যায়। ফলে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে বছরের একটি বিশেষ সময় মধ্যরাতেও সূর্য দেখা যায়। কিন্তু যখন কুমেরু অঞ্চলে শীতকাল, তখন দিন ও রাতের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যায় না। কারণ সূর্য সেখানে উঠেই না। পুরো কুমেরু অঞ্চল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঠিক তখন (এপ্রিল থেকে জুলাই) সুমেরু অঞ্চল পুরো ২৪ ঘণ্টাই সূর্যালোকিত দিন উপভোগ করে। নিয়ম মেনেই সূর্য উঠে এবং অত্যন্ত ধীরগতিতে পরিভ্রমণ শুরু হয়। সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যেতে যেতে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত পৌঁছয়। কিন্তু তারপর স্বাভাবিক নিয়মে সম্পূর্ণ অস্ত না গিয়ে পুনরায় উঠতে শুরু করে। সুমেরু অঞ্চলে প্রায় দু'মাস এই অবস্থা চলতে থাকে। তবে প্রকৃত মধ্যরাতের সূর্য দেখা যায় ২১ জুন। ছয়মাস পর সুমেরু অঞ্চল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং কুমেরু অঞ্চল সূর্যালোকিত হয়। কুমেরু অঞ্চলে মধ্যরাতে সূর্য দেখা যায় নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত। উত্তর অক্ষাংশের প্রান্তিক অঞ্চলকেও কখনও কখনও মধ্যরাতের সূর্যের দেশ আখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর কানাডার বাইলট টিপের কাছেও মধ্যরাতেও সূর্য দেখা যায়।

বিশ্বজুড়ে নরওয়ে শান্তির দেশ হিসেবেও চিহ্নিত। প্রতি বছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে (১০ ডিসেম্বর) অসলোর বিশ্ববিখ্যাত সিটি হল থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। শান্তির প্রতীকস্বরূপ অসলোর জাহাজ বন্দরে একটি শিখা চিরপ্রজ্বলিত আছে। অসংখ্য অভিযাত্রী আর আবিষ্কারকের দেশ হিসেবেও নরওয়ে বিশ্ববিখ্যাত।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

ক্যুইজ

১) কোন যন্ত্র ফুসফুসের অক্সিজেন নেওয়ার পরিমাণ নির্ণয় করে?
২) লোহিত কণিকা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে কী হয়?
৩) মাইনর কার্পের উদাহরণ কোন কোন মাছ?
৪) জলাভূমির জলভাগের সাধারণ গভীরতা কত?
৫) বিপন্ন প্রজাতির একটি উদ্ভিদের নাম কী?
৬) মানুষের শরীরের সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি কোনটি?
৭) জীবাণুর ক্রিয়ায় মৃত পাতা কীসে পরিণত হয়?

৮) কোন প্রাণীর রক্তের রং বেগুনি?
৯) চোখের জলে কোন উৎসেচক পাওয়া যায়?
১০) সদ্যজাত শিশুদের প্রতি মিনিটে হৃদস্পন্দন কত?
১১) মস্তিষ্কের বাইরে যে পাতলা আবরণ থাকে তার নাম কী?
১২) মহিলাদের হৃৎপিণ্ডের ওজন কত?
১৩) রক্ততঞ্চনের জন্য কতক্ষণ সময় লাগে?
১৪) প্যাটাগোনিয়া মালভূমি কোন দেশে অবস্থিত?
১৫) ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কী?
১৬) দক্ষিণ আমেরিকার আদি অধিবাসী কারা?
১৭) মানুষের প্রতিটি হাতে কতগুলি হাড় থাকে?
১৮) বাষ্পমোচন বিরোধী উপাদানগুলি কী?
১৯) সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট কী?
২০) বিমানের এয়ারক্রাফট তৈরি হয় কোন ধাতু দিয়ে?
২১) ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড কী নামে পরিচিত?
২২) কার কোষ বিভাজন ঘটে না?
২৩) প্রোটিনের অভাবে শিশুদের কী রোগ হয়?
২৪) দুটি কুঁজ বিশিষ্ট উট কোথায় পাওয়া যায়?
২৫) ডিহাইড্রেশনের সময় শরীরে তরলের পরিমাণ শতকরা কত বিনষ্ট হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে?
২৬) স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন কী?
২৭) কোথায় সোয়ান কোষ লক্ষ করা যায়?
২৮) কোষ প্রাচীর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান কোনটি?
২৯) বদ্ধ জলাশয়ে শৈবালের বৃদ্ধিকে কী বলা হয়?
৩০) শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকায় কিসের পরিমাণ বেশি?
৩১) শ্বেতকণিকা কী পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে?
৩২) মাইটোকন্ড্রিয়ায় শতকরা কত ভাগ প্রোটিন থাকে?

৩৩) নীল জবাফুলের পাপড়িতে কী প্লাসটিড থাকে?
৩৪) মটরগাছ কোন গোত্রের উদ্ভিদ?
৩৫) ব্যাঙাচি আকৃতির একটি ভাইরাসের নাম কী?
৩৬) রজনগ্রন্থি আছে কোন উদ্ভিদে?
৩৭) কোন উদ্ভিদের পাতার ওপরের ত্বকে পত্ররন্ধ্র পাওয়া যায়?
৩৮) কোন ধরনের পেশিতে টিটেনাস হতে পারে?
৩৯) ঊর্ধ্বমহাশিরা হৃৎপিন্ডের কোন অলিন্দ থেকে উৎপন্ন হয়?
৪০) গিনিপিগের কোন ধরনের দাঁত থাকে?

উত্তর: ১) ডগলাস ব্যাগ বা স্পাইরোমিটার। ২) পলিসাইথিমিয়া। ৩) বাটা ও পুঁটি। ৪) ২.৫ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার। ৫) ঘৃতকুমারী। ৬) পিনিয়াল গ্রন্থি। ৭) হিউমাসে। ৮) গোলকৃমির। ৯) লাইসোজোম। ১০) ১২০ বার। ১১) মেনিনজেস। ১২) ২৮০ গ্রাম। ১৩) ৫-৭ মিনিট। ১৪) আর্জেন্টিনা। ১৫) ব্রাসিলিয়া। ১৬) রেড ইন্ডিয়ান। ১৭) ৩০টি। ১৮) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, ফিনাইল ও অ্যাসপিরিন। ১৯) পিত্তলবণ। ২০) ডুরালিয়াম। ২১) ব্লিচিং পাউডার। ২২) ভাইরাসের। ২৩) ম্যারাসমাস ও কোয়াশিওরকর। ২৪) মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে। ২৫) ২০%। ২৬) পলিস্যাকারাইড। ২৭) স্নায়ুকোষ বা নিউরোনে। ২৮) ক্যালসিয়াম। ২৯) ইউট্রফিকেশন। ৩০) খনিজ লবণের। ৩১) ফ্যাগোসাইটোসিস। ৩২) ৭০ শতাংশ। ৩৩) ক্রোমোপ্লাসটিড। ৩৪) শিম্বগোত্রীয়। ৩৫) ব্যাক্টেরিওফাজ। ৩৬) পাইন। ৩৭) পদ্ম। ৩৮) অস্থি পেশি। ৩৯) ডান অলিন্দ। ৪০) ক্যানাইন দাঁত।

এডু টিপস

সঠিকভাবে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করার পদ্ধতি

কথোপকথনের জন্য প্রয়োজন হয় ভাষার। ভাষা ছাড়া আমরা একে-অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। মাতৃভাষায় কথা বলার পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্রেও অন্যান্য ভাষার দরকার হয়। সেইসঙ্গে দরকার সঠিক উচ্চারণ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এক সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম ইংরেজি। আর এই যোগাযোগের প্রয়োজনেই আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কখনও কখনও নিজের অজান্তেই কিছু বহু প্রচলিত শব্দ ভুলভাবে উচ্চারণ করে ফেলি। ভাষাবিদদের মতে, এর পিছনে রয়েছে জিভের আলসেমি, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, না জানা কিংবা সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা। আবার কিছু ভুল উচ্চারণই আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত হওয়ায় অনেকেই ভুল উচ্চারণকেই সঠিক মনে করেন।

এবার আমরা জেনে নিই, আমরা কী কী শব্দের ভুল উচ্চারণ করি:

Almond (আহ্-মান্ড)

প্রথমেই আসি কাঠবাদামের কথায়, যাকে ইংরেজিতে বলে Almond (আহ্-মান্ড)। অনেকেই এর উচ্চারণ করে থাকেন আলমান্ড (Al-mond), এটি কিন্তু ভুল। Almond শব্দটির ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণ (L) উহ্য থাকে বলে এর সঠিক উচ্চারণ হবে আহ্-মান্ড (Ah-mond)।

কাজেই এভাবে বলা যেতে পারে, I would like to eat five Almonds (আই উড লাইক টু ইট ফাইভ আহ্-মান্ডস), অর্থাৎ আমি পাঁচটি কাঠবাদাম খেতে চাই।

চিকিৎসকরা বলেন, কাঠবাদাম হল ভিটামিন-এ ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ একটি ফল, যা শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) কমাতে সাহায্য করে।

Pizza (পিৎজা)

মুখরোচক খাবার Pizza। অনেকেই আমরা সহজে উচ্চারণ করতে গিয়ে পিৎজা বা পিজ্জা বলে থাকি। এটা একেবারেই ভুল। এর সঠিক উচ্চারণ হবে পিৎজা (Peet-zha)। তাই এবার থেকে বলতে হবে Can I have a Pizza (পিৎজা)।

Dengue (ডেঙ্গি)

বাংলাদেশে মশাবাহিত এই রোগটিকে ডেঙ্গু বা ডেঙ্গিউ নামে উচ্চারণ করা হলেও এর সঠিক উচ্চারণ ডেঙ্গি (Den-gee)।

অনেকে কথা বলার সময় বলেন, I have suffered from dengue (ডেঙ্গু, ডেঙ্গিউ) fever। উচ্চারণবিদরা একে ভুলে তালিকাতেই রেখেছেন। যার সঠিক উচ্চারণ হবে ডেঙ্গি (Den-gee)।

Sour (সাওয়ার)

এরপর আসি Sour (সাওয়ার) শব্দটিতে। যা আমরা কোনও তেতো বা টক স্বাদ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। অনেকেই এর উচ্চারণ 'সার', 'সুয়ার' করেন, যা ভুল। পাওয়ার (Power) বা শাওয়ার (Shower)-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে উচ্চারণ করুন 'সাওয়ার' (sour)।

Coupon (কু-পউন)

আরেকটি ভুল উচ্চারিত শব্দ হল কুপন (Coupon)। যার সঠিক উচ্চারণ হল কু-পউন (Cu-pawn)। শেষ ভাগটির ছন্দ ল-উন (Lawn) বা শ-উন (Shawn)-এর মতো। তবুও অনেকেই এর উচ্চারণ 'কুপন' বা 'কপন' বলে মনে করে।

Plumber (প্লামার)

মিস্ত্রি বা কারিগর, যাঁরা বাড়িতে জল সরবরাহ লাইন ঠিক করে থাকেন, তাঁদের ইংরেজিতে বলে Plumber (প্লামার)। Plumber উচ্চারণের সময় ইংরেজির (B) বর্ণটি উহ্য থাকে বলে এর সঠিক উচ্চারণ হবে প্লামার। কিন্তু আমরা নিজের অজান্তে (B) বর্ণটিসহ প্লাম্বার উচ্চারণ করে থাকি, যা একেবারেই ভুল।

February (ফেব্রুয়ারি)

খ্রিস্টীয় বর্ষের দ্বিতীয় মাস February (ফেব্রুয়ারি)। অনেকেই উচ্চারণের সময় জিভের আলসেমিবশত, (r) বর্ণটি উহ্য রেখে উচ্চারণ করেন ফেবুয়ারি, যা একেবারেই ভুল। কাজেই সঠিক উচ্চারণ হবে, ফেব্রুয়ারি।

DEBRIS (**ডেবরি/দেবরি**)

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কোনও কিছুর ধ্বংসাবশেষকে ইংরেজিতে বলে Debris (ডেবরি)। Almond ও plumber-এর মতো Debris শব্দে s বর্ণটি উহ্য থাকে।

যার সঠিক উচ্চারণ দাঁড়ায় ডেবরি (Debri)।

Lingerie (লনজারে)

অন্তর্বাস বা রাতের শোবার পোশাককে ইংরেজিতে বলা হয় লনজারে (Lawn-gray)। ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করতে গিয়ে অনেকে ভুল করে একে বলেন লিংগারি', যা আসলে ভুল। মানুষ পোশাক-আশাক নির্বাচনে যেমন সচেতন হয়, তেমনি এই শব্দটির উচ্চারণেও সঠিক হতে হবে। সঠিক উচ্চারণ হল লনজারে।

Asthma (অ্যাজমা)

শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত এই রোগটির সঠিক উচ্চারণ Asthma (অ্যাজমা)। অনেকেই এর উচ্চারণ 'এসসথেমা' বা 'এসথমা' বলে ভুল করে।

Mojito (মোহিতো)

মোহিতো (Mojito) এক ধরনেরশরবতজাতীয় পানীয়। অনেকেই ইংরেজি বানানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর মোজিটো, মোজিতো উচ্চারণ করে ভুল করেন। শব্দটির বুৎপত্তি স্প্যানিশ হওয়ায়, (J) বর্ণটির উচ্চারণ 'জ' না হয়ে 'হ'-এর মতো হবে। এর সঠিক উচ্চারণ হল মোহিতো (Moheeto)। সুতরাং বলা যেতে পারে I would like to have a glass of Mojito (মোহিতো)। একইভাবে baja islands বাজা দ্বীপপুঞ্জ নয়, বাহা দ্বীপপুঞ্জ।

Pronunciation (প্রোনানশিয়েশন)

উচ্চারণপ্রণালির ইংরেজি শব্দ Pronunciation (প্রোনানশিয়েশন)। অনেকেই ভুলবশত প্রোনাউনশিয়েশন (Pronounciation) উচ্চারণ করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, এর উচ্চারণ নাউন (noun) বা নান (nun)-এর মতো নয়। তাই এর সঠিক উচ্চারণ হবে প্রোনানশিয়েশন (Pronunciation)।

Espresso (এস্প্রেসো)

ঘন, কালো কফি হল (Espresso) এস্প্রেসো। আমরা যখন খুব বেশি ক্লান্ত থাকি, তখন তাৎক্ষণিক এনার্জি পেতে সাধারণত এস্প্রেসো কফি পান করে থাকি। কফিশপে গিয়ে অনেকেই অসাবধানবশত এক্সপ্রেসো বলে থাকেন, যা ভুল। এস-কে এক্স বলা পুরোপুরি ভুল। কাজেই কফিশপে গিয়ে সঠিকভাবে অর্ডার করতে হলে বলতে হবে : Can I have a cup of Espresso? (এস্প্রেসো)

Et cetra (এট সেটরা)

আরেকটি সচরাচর ভুল উচ্চারিত শব্দ হল Et cetra (এট সেটরা)। একে সংক্ষেপে Etc লেখা হয়। অনেকেই 'এক্টসেট্রা' উচ্চারণ করে ভুল করে। যার সঠিক উচ্চারণ হল 'এট সেটরা' (et cetra)।

I have plenty of novels such as Robinson Crusoe, Pride and Prejudice et cetra (এট সেটরা)।

Hierarchy (হাইরারকি)

পদমর্যাদার ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ, যার ইংরেজি শব্দ হল Hierarchy। অফিসে পদমর্যাদা বোঝাতে 'Hierarchy' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। অনেকেই এর উচ্চারণ 'হায়ারারকি' (hayararche) বলে ভুল করে, যার সঠিক উচ্চারণ হবে হাইরারকি'।

Education (**এজ্যুকেশন**)

সবশেষে সর্বত্র প্রচলিত শব্দ শিক্ষা শব্দটির কথা বলা যেতে পারে। যার ইংরেজি হল Education। কিন্তু এই বহুল প্রচলিত শব্দটিই অনেকেই 'এডুকেশন' বলে ভুল করেন। চমকপ্রদভাবে, এই ভুলটাই সমাজে সঠিক উচ্চারণের স্থান দখল করে আছে। এর সঠিক উচ্চারণ হল এজ্যুকেশন (Ejucation)।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বৈকাল হ্রদ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক হ্রদ বা লেক রয়েছে। আজ আমরা রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব। বৈকাল হ্রদ রাশিয়ার সাইবেরিয়ার দক্ষিণভাগে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন হ্রদ। এটির চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। হ্রদটির আয়তন প্রায় ৩১ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার। এটি বিশ্বের গভীরতম হ্রদ। এর সর্বাধিক গভীরতা ১ হাজার ৬৩৭ মিটার। তিনশো'র বেশি নদীর জল এসে এই হ্রদে পড়েছে। ধারণা করা হয়, ২৫ থেকে ৩০ মিলিয়ন বছর আগে বৈকাল ফাটল এলাকার ভূগর্ভে তীব্র আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে একপ্রকার ফাটলের সৃষ্টি হয়, আর তারই ফলে এই বিশাল জলাশয়— বৈকাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। আয়তনের মতো গভীরতার বিচারেও এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হ্রদ। ৫ লাখ ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা ২ লাখ ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। এই হ্রদ লম্বায় ৬৩৬ কিলোমিটার বা ৩৯৫ মাইল চওড়া। সর্বোচ্চ ৭৯ কিলোমিটার বা ৪৯ মাইল। এর গড় গভীরতা ৭৪৪.৪ মিটার বা ২ হাজার ৪৪২ ফুট। আর সর্বোচ্চ গভীরতা ১ হাজার ৪৪২ মিটার বা ৫ হাজার ৩৮৭ ফুট। সৈকত বা বেলাভূমির দৈর্ঘ্য ২ হাজার ১০০ কিলোমিটার (১ হাজার ৩০০ মাইল)। বৈকাল হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ হাজার ১৮৬.৫ মিটার বা ৩ হাজার ৮৯৩ ফুট নীচে।

বহুকাল ধরে ইউরোপের মানুষ সাগর সদৃশ এই হ্রদের খবর জানত না। রাশিয়া এই অঞ্চলে তাদের রাজ্য সম্প্রসারিত করলে সর্বপ্রথম কুরবাত ইভনিভ নামক এক রুশ অনুসন্ধানী গবেষক ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকায় আসেন। তাঁর মাধ্যমে জানা যায়, প্রকৃতির অপরূপ বিস্ময় ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি বৈকাল হ্রদ এবং তার পাড় জীব-বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। হ্রদের পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ১ হাজার ৭০০'রও বেশি প্রজাতির গাছপালা ও জীবজন্তু রয়েছে, যার এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতির এক আশ্চর্য বিস্ময় এ হ্রদটি মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর আশপাশের অরণ্য অঞ্চল জীববৈচিত্র্যের এক বিপুল প্রাকৃতিক সম্ভার। বৈকাল হ্রদ এলাকায় সতেরোশ'রও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, যাদের দুই-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বৈকাল হ্রদের জলে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। হ্রদের পাঁচ হাজার ফুট গভীরেও জলজ প্রাণীর বাস রয়েছে। এখানে রয়েছে ওমূল, গোলেমিংকা, স্যামন প্রভৃতি মাছ এবং নানাজাতের শামুক, শ্যাওলা।

১৯৯৬ সালে এটিকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। বৈকাল হ্রদ সাইবেরিয়ার 'নীল নয়ন' বা 'সাইবেরিয়ার মুক্তা' নামেও পরিচিত। এখানে সঞ্চিত জল আয়তন অনুযায়ী এটি বিশ্বের বৃহত্তম মিষ্টি জল হ্রদ। এখানে জলের পরিমাণ উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেক্সের সবগুলো হ্রদে সঞ্চিত মিষ্টি জলের চেয়ে বেশি। বৈকাল হ্রদ প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পুরনো। এটিকে বিশ্বের প্রাচীনতম হ্রদও বলা হয়।

এটি লেক, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির মতো ছোট জলাশয় নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা নদীর চেয়েও বিশাল। তবে হ্রদ বা লেকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে অন্য নদী বা সাগরের সঙ্গে মেশে না। লেক হল আবদ্ধ জলাশয়। কোনও কোনও লেকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা এতো বেশি যে তা দেখে রীতিমতো আশ্চর্য লাগে। অনেক হ্রদ আবার আয়তন ও গভীরতায় ছোট হয়। কিছু হ্রদ মানুষের তৈরি। হ্রদ হল মানুষ নানা প্রয়োজনে মাটি কেটে নেওয়ার ফলে সৃষ্ট জলাশয়। এই হ্রদে রয়েছে ছোট-বড় ২৭টি দ্বীপ। সবচেয়ে বড় দ্বীপটির নাম ওলখন, যা লম্বায় ৭২ কিলোমিটার।

বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ স্বচ্ছ জলের হ্রদ। বিশালতার কারণে প্রাচীন চিনা পাণ্ডুলিপিতে এই হ্রদকে 'উত্তর সাগর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বুরিয়াত নামক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। বৈকাল শীতপ্রধান এলাকা। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের নীচে থাকে, আর গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। শীতকালে হ্রদের জল বরফ হয়ে পুরো আস্তরণ পড়ে যায়। তখন তার ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়। প্রকৃতির বিস্ময় বৈকাল হ্রদে সারাবছরই গোটা বিশ্বের অনুসন্ধানী গবেষক আর সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।